দেশে পানীয় জলের ঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য

বর্তমান বিশ্বের একটি জটিল ও উদ্বেগজনক বাস্তবতা পানি সংকট। যদিও পৃথিবীর একটি বড় অংশ জলমণ্ডিত,তবু ব্যবহারের জন্য উপযোগী পানযোগ্য পানির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণের কারণে এই সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে পানীয় জলের বৈষম্য বাড়ছে। ওয়াটার এইড-এর এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য আরও বেড়েছে, যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় মিষ্টি পানির অভাব দেখা দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণও অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছে ভবিষ্যতে পানীয় জলের সন্ধানের লড়াই আরও তীব্র হবে। উত্তর বাংলাদেশের খরা-প্রবণ বরেন্দ্রভূমি এলাকায়, মানুষকে নিরাপদ পানীয় জল পেতে ৩৫০ মিটারের বেশি খনন করতে হবে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, কারণ এই এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে কম বৃষ্টিপাতের অর্থ হল ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি পুনরায় পূরণ হচ্ছে না। এমনকি ঢাকায়ও মানুষ পানির সরবরাহ কমে যেতে পারে। ঢাকার ভূগর্ভস্থ জলরাশিগুলি রিচার্জ হয় যা আশেপাশের জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলে সঞ্চারিত হয়। তবে সেই জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ মিঠা জলের স্তরও নেমে গেছে, যার ফলে সমুদ্রের জল জলাশয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এভাবে চলতে থাকলে ঢাকার পানীয় জল ক্রমশই পানের অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। খারাপ পানির গুণমান কৃষিকে প্রভাবিত করবে। বাংলাদেশ ধান, পাট, গম, চা, ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি এবং ফল চাষের জন্য উৎসর্গীকৃত জমির ৭০ শতাংশ সহ কৃষির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। দূষিত নলকূপগুলি সেচের জন্য ব্যবহৃত বেশিরভাগ পানি সরবরাহ করে। ফলস্বরূপ, উচ্চ মাত্রার আর্সেনিক অনেক ফসলের উদ্ভিদ, বিশেষ করে ধান এবং মূল শাকসবজি দ্বারা শোষিত হয়। এটি মারাত্মক হতে পারে।
বাংলাদেশে পানীয় জলের ঘাটতি ও বৈষম্য জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দূষণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে, যেখানে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ পানি সংকটে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই সংকটের কারণে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর শিকার হচ্ছে। এর সমাধান হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, এবং সবার জন্য পানির অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
পানির মান উন্নত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে

বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে, বিশ্বব্যাংকের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পানি অ্যাক্সেসের উন্নতিতে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, সমস্ত উন্নত পানির উৎসগুলোর ৪১ শতাংশ ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষিত, যা মল দূষণের উচ্চ প্রকোপ নির্দেশ করে ৷ ‘প্রমিসিং প্রোগ্রেস: এ ডায়াগনস্টিক অফ ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন, হাইজিন এবং পোভার্টি’ প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে পানীয় পানির দুর্বল গুণমান ধনী-দরিদ্র এবং গ্রামীণ ও শহুরে জনগণকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। তবে, জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্রতম কুইন্টাইল পানি সম্পর্কিত গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল রোগে তিনগুণ বেশি ভোগে। আজ, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পানির উৎস থেকে পানির অ্যাক্সেস রয়েছে। তবে পানির মান খারাপ। সারা দেশে নমুনা নেওয়া জলের কলের ৮০ শতাংশই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত ছিল, যা পুকুর থেকে উদ্ধার করা জলের সমান। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) ২০১৯ সালে ‘ওয়াটার গভর্নেন্স ইন ঢাকা’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, ঢাকায় মাথাপিছু পানির ব্যবহার ৩৬০ লিটার। এর মধ্যে বাড্ডা, কুড়িল ও জোয়ার সাহারা এলাকার মানুষের পানির গড় ব্যবহার ২১৫ লিটার। আর গুলশান ও বনানী এলাকায় মাথাপিছু পানির ব্যবহার ৫০৯ লিটার। ঢাকায় নিম্ন আয় এবং উচ্চ আয়ের মানুষের পানির মূল্য একই, প্রতি হাজার লিটারে ১৫ টাকা ১৮ পয়সা।আয়ের নিরিখে সমতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের কথা ঢাকা ওয়াসা অনেক দিন ধরেই বলে যাচ্ছে। কিন্তু এটি এখনো কথাবার্তার পর্যায়েই রয়ে গেছে। দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ জলের উত্সে আর্সেনিকের মাত্রা বাংলাদেশের প্রান্তিকের উপরে রয়েছে। চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ আর্সেনিক দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করছে যা পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবা ব্যাহত করছে। দুর্যোগের সময়, দেশের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবার দূষিত, অপরিবর্তিত জলের উত্সগুলিতে চলে যায়। উপকূলীয় এলাকাগুলো ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা দরিদ্রদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের আর্সেনিক দূষণের সংস্পর্শে আসা দেশ। বাংলাদেশের ১.৮ মিলিয়নেরও বেশি লোকের উন্নত পানির উত্সের অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে। ইউএন ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২২ অনুসারে, সবচেয়ে বেশি আনুমানিক বার্ষিক ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনকারী দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ স্থান। বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ এবং ২০৩০ ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপ দ্বারা সমর্থিত একটি সমীক্ষা অনুসারে বর্তমান হারের তুলনায় শতকরা হার দ্রুত। ভূগর্ভস্থ একটি ভেদযোগ্য শিলা স্তরে বিশুদ্ধ পানির বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার রয়েছে এবং সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের পানির মাধ্যমে তা রিচার্জ হয়। যেসব ক্ষেত্রে

অ্যাকুইফার থেকে জল তোলার হার রিচার্জের হারকে ছাড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পরিচালিত অ্যাকুইফার রিচার্জ অন্যান্য উৎস থেকে জল প্রবেশ করাতে পারে যা সাধারণত ভেদযোগ্য শিলা পর্যন্ত পৌঁছায় না।
সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুরসহ উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জসহ হাওর অঞ্চলের গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের প্রতিদিনের একটি বড় সময় কাটে দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহে। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তারা অনেক সময় যৌন হয়রানি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হন। জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বে এখনো ২.২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে এবং ৩.৫ বিলিয়ন মানুষ পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
উত্তর আফগানিস্তানে কুশ তেপা খাল নির্মাণ প্রকল্পের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে এটি মূলত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত। তবে এই প্রকল্পটি আমু দরিয়া নদীর প্রায় ২০ শতাংশ পানি সরিয়ে নেবে, যার ফলে উজবেকিস্তানের কিছু অঞ্চলের চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ব্যাহত এবং পানির ঘাটতি আরও তীব্র হবে। এতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে, বাংলাদেশও বহু বছর ধরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য পানির হিস্যা আদায়ে জোর দাবি জানিয়ে যাচ্ছে। যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) চুক্তি অনুসারে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ন্যায্য পানিবণ্টন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা জরুরি। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পেহেলগাম ইস্যু ঘিরে যে যুদ্ধাবস্থা ও উত্তেজনা তৈরি হয়, সেখানেও ভারত সিন্ধু নদের পানি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এভাবে আমরা দেখতে পাই, কখনো কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে গাজার হাজারো মানুষকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, আবার কখনো আন্তঃদেশীয় নদীর পানির প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে প্রতিবেশী দেশকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পানি বা খাদ্য উভয়ই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়েছে যে ‘বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করা অপরিহার্য।’ বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, আমরা দ্রুত এক বৈশ্বিক পানি সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। গত জুন মাসে ‘মার্সি কর্পস’ নামের একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা বলেছে আফগানিস্তানের কাবুল বিশ্বের প্রথম আধুনিক শহর হতে পারে, যেখানে নিকট ভবিষ্যতে পানি শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক রিচার্জের হারের চেয়েও বেশি পানি উত্তোলন এবং সীমিত পরিমাণে পানি দূষণের সমস্যা দেখা দেওয়ায় শহরটি এক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংকটে আমরা কোথায়?: শিল্পায়ন, বৃষ্টির

পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাব, অকার্যকর মজুদ ব্যবস্থাপনা, পানির অসম বণ্টন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার এ সবই বাংলাদেশের পানি সংকটকে দিন দিন তীব্রতর করে তুলছে। শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে বোরো ধান উৎপাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ পানির প্রয়োজন, যার প্রধান উৎসই ভূগর্ভস্থ পানি। বাংলাদেশে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের ৭০-৮০ শতাংশ হয় জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে। এই বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিকভাবে লবণাক্ততা ও আর্সেনিকমুক্ত এবং এতে ক্ষতিকর খনিজের মাত্রাও কম, ফলে এটি মানুষের ব্যবহারের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ। বিশাল পরিমাণ বৃষ্টির জল যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমানো সম্ভব। ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ হ্রাস পাবে। তাই রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এর প্রসার ও সচেতনতা জরুরি।
ঢাকা শহরের মতো শহুরে এলাকায়, যেখানে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে ভূগর্ভস্থ পানি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ একটি বাস্তবসম্মত ও অর্থনৈতিক সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহে দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নিতে পারে। এর সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং সামাজিক সহযোগিতা জরুরি। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দৃঢ় নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উজান পরিবেশের অবক্ষয় রোধে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াটার হার্ভেস্টিং সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিতে ভর্তুকি প্রদান করে সাধারণ মানুষের উৎসাহ বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে- যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে, তা হবে পানির ন্যায্য বণ্টন নিয়ে বিরোধের কারণে। তাই একটি স্থিতিশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, মানবাধিকার রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য কমাতে, পানির সুষ্ঠু ও ন্যায্য বণ্টন অপরিহার্য।
লেখক: সাংবাদিক